SECOND SEMESTER

SUBJECT -ZOOLOGY (GENERAL)

UNIT – 11(POPULATION AND COMMUNITY)

TOPIC- POPULATION

SUBMITTED BY DEBIKA DE

Scanned by CamScanner

সূচনা (Introduction) :

'পপুলেশন' শব্দটি ল্যাটিন *populus* থেকে গৃহীত। সাধারণ ভাবে পপুলেশন (population) বলতে বোঝায় বিশিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী একদল মানুষ। কিন্তু বাস্তুবিদ্যায় এই পপুলেশন শব্দটির প্রয়োগক্ষেত্র একটু ভিন্ন। বিভিন্ন বাস্তুবিদ বিভিন্নভাবে পপুলেশনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন যদিও বিভিন্ন সংজ্ঞার মৌলিক ধারণা একই প্রকার। আমরা এখানে কয়েকজন বাস্তুবিদের দেওয়া সংজ্ঞার উল্লেখ করছি।

বাস্তুবিদ Odum (1971) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা '**একই স্থানে বসবাসকারী একই প্রজাতিভুক্ত জীবগোষ্ঠী বা খুবই নিকট সম্পর্কিত জীবগোষ্ঠী যাদের মধ্যে জিনের আদান প্রদান ঘটে তাদের পপুলেশন বলে।**' (A collective group of organisms of the same species or closely related group within which individual may exchange genetic information in a particular space).

Chapman Jr. (1971) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা—'**একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে একই প্রজাতিভুক্ত সকল সদস্যদের একত্রে পপুলেশন বলে।**' (The total assemblage of individuals of a given species found in any ecosystem under study is known as population).

Smith (1974) কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা—'**একই সময়ে একই স্থানে বসবাসকারী একই প্রজাতিযুক্ত সকল সদস্যকে একত্রে পপুলেশন বলে।**' (Population is a group of organism of same species occupying a particular area at a particular time).

সংজ্ঞা যে ভাবেই দেওয়া হোক পপুলেশনের সকল সদস্যরা সাধারণত একই প্রজাতিভুক্ত হয়। যেমন—গির অঞ্চলের সিংহের পপুলেশন, তৃণভূমির গঙ্গাফড়িং, জঙ্গলের শালগাছ প্রভৃতি পপুলেশনের উদাহরণ। পপুলেশন একটি একক যার মধ্য দিয়ে শক্তির প্রবহন চলে এবং পুষ্টি পদার্থ চক্রাকারে আবর্তিত হয়। পুপলেশন একটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী তন্ত্র যা বাস্তুতন্ত্রকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করে।

❑ পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of population) :

পপুলেশনের নিজস্ব কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যে বৈশিষ্ট্যগুলি এর গঠন ও বিস্তারণকে প্রভাবান্বিত করে। বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :

(1) **পপুলেশনের ঘনত্ব** (Population density)
(2) **জন্মের হার** (Natality)
(3) **মৃত্যুর হার** (Morality)
(4) **বয়সভিত্তিক বিস্তারণ** (Age distribution) ✓
(5) **পপুলেশনের বৃদ্ধি এবং হার** (Growth form and rate of population)
(6) **পপুলেশনের বিস্তার** (Dispersion of population)
(7) **পপুলেশনের আকার নিয়ন্ত্রণ** (Regulation of population size)

❑ বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা (Discussion on characteristics of Population) :

(1) পপুলেশনের ঘনত্ব (Population density) :

স্থলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে পপুলেশনের ঘনত্ব বলতে একক অঞ্চলে (unit area) কতকগুলি প্রাণী বাস করে তা বোঝায় কিন্তু জলজ প্রাণীর ক্ষেত্রে একক অঞ্চলে কত আয়তনের (volume) প্রাণী আছে তা নির্দিষ্ট করে। উদাহরণস্বরূপ এক লিটার জলে

Scanned by CamScanner

কতগুলি প্যারামেসিয়াম আছে অথবা ১০০ বর্গ কিমি অঞ্চলে কতগুলি সিংহ আছে অথবা এক হেক্টর জঙ্গলে কতগুলি শাল গাছ আছে প্রভৃতি পপুলেশনের ঘনত্ব বোঝায়। আবার পপুলেশনের সদস্যদের আকার আকৃতি প্রায় একই প্রকার। যেমন—স্তন্যপায়ী প্রাণী, পাখি বা পতঙ্গ তাদের ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতিতে ঘনত্ব মাপা সহজ। যেমন মনে করি ১০০ বর্গ কিলোমিটারে ৩০০টি সিংহ আছে অর্থাৎ সিংহের ঘনত্ব ৩০০। কিন্তু প্রাণীর আকার আকৃতির যদি খুব বেশি পার্থক্য থাকে যেমন মাছে দেখা যায় তখন একক অঞ্চলে কত জীবভর (biomass) আছে তা নির্ণয় করে মাছের ঘনত্ব নির্ণয় করা হয়।

পপুলেশনের ঘনত্ব দুভাবে প্রকাশ করা হয়। যেমন—(ক) **স্বাভাবিক ঘনত্ব** (Crude density) এবং (খ) **বাস্তুবিদ্যার ঘনত্ব** (Ecological density)।

(ক) **স্বাভাবিক ঘনত্ব (crude density) ঃ** সমগ্র অঞ্চলের একক সীমানায় কতকগুলি প্রাণী আছে বা কতটা জীবভর আছে তাই স্বাভাবিক ঘনত্ব।

(খ) **বাস্তুবিদ্যার ঘনত্ব (ecological density) ঃ** বৃহৎ অঞ্চলের একক সীমানায় কতগুলি প্রাণী প্রকৃতপক্ষে বাস করে বা প্রকৃত কতটুকু জীবভর পাওয়া যায় তাই বাস্তুবিদ্যার ঘনত্ব নির্দেশ করে।

সহজ উদাহরণের সাহায্যে উভয় প্রকার ঘনত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন শীতকালে যখন বৃষ্টি হয় না তখন যে পুকুরে মাছ চাষ করা হয় তার জলস্তর অনেক নীচে নেমে যায় অর্থাৎ পুকুরের জলের পরিমাণ বেশ কমে যায়। ফলে ছোটো মাছের স্বাভাবিক ঘনত্ব কমে যায় কিন্তু বাস্তুবিদ্যার ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় কারণ স্বল্পপরিসর স্থানে অনেক মাছ একত্রিত হয়। ওই সময় যে সকল পাখি শুধুমাত্র মাছ খায় তারা তখন ডিম পাড়ে কারণ শাবকদের খাদ্যের অভাব ঘটে না যেহেতু স্বল্প স্থানে অধিক মাছ আছে ফলে পাখিদের ঘনত্ব বাড়ে।

বর্ষাকালে পুকুরের জলের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রজনন কাজের ফলে মাছের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এবং ছোটো মাছের স্বাভাবিক ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু **বাস্তুবিদ্যার ঘনত্ব** (ecological density) হ্রাস পায়। কারণ বিস্তীর্ণ পরিসরে মাছগুলি বিস্তৃত থাকে। এটি বাস্তুবিদ্যার ঘনত্ব।

সুতরাং স্বাভাবিক বাসস্থানে সামগ্রিক প্রজাতির সংখ্যাই পপুলেশনের ঘনত্ব। ঘনত্বের সূত্র মাধ্যমে এটি সহজেই নির্ণয় করা যায়। যেমন, $D = \frac{n/a}{t}$ যেখানে D = ঘনত্ব, n = সদস্য সংখ্যা, a = একক অঞ্চল, t = সময় একক।

যে-কোনো অঞ্চলের পপুলেশনের ঘনত্ব পরিবর্তনশীল এবং ঋতু, খাদ্য, আবহাওয়া প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। একক অঞ্চলে খাদ্য ও আকার-আকৃতির উপর নির্ভরশীল। পপুলেশনের ঘনত্বেরও একটি উর্ধ্বসীমা আছে। জীব যত ছোটো হয় একক অঞ্চলে তার সংখ্যাও তত বেশি। যেমন ১০০ একরের একটি জঙ্গলে যত হরিণ থাকতে পারে তার অনেকগুণ বেশি ইঁদুর থাকতে পারে। প্রাণী খাদ্যশৃঙ্খলের যত উপরে একক অঞ্চলে তার ঘনত্বও তত কম। এ ছাড়াও জন্ম-মৃত্যুর হার, সদস্যদের আগমন বা অন্যত্র পরিযাণ ঘনত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(2) জন্মের হার (Natality) ঃ

সংজ্ঞা (Difinition) ঃ প্রজনন ক্রিয়া ও জন্মের মাধ্যমে যে হারে নতুন সদস্য পপুলেশনে যুক্ত হয় তাকে জন্মের হার বা ন্যাটালিটি (Natality) **বলে।** ন্যাটালিটির ফলেই পপুলেশনের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে (Ecological density) এবং পপুলেশনে আয়তনে বৃদ্ধি পায়।

ন্যাটালিটি বা জন্মের হার আবার দুপ্রকার। যথা—

(ক) **সর্বোচ্চ বা পোটেনশিয়াল ন্যাটালিটি (Maximum or potential natality) ঃ** আদর্শ বাস্তুবিদ্যার এবং জেনেটিক্যাল অবস্থায় একক সময়ে তত্ত্বগতভাবে (theoretical) যে সর্বোচ্চ সংখ্যার জন্ম হতে পারে তাকে 'সর্বোচ্চ ন্যাটালিটি' বলে। এর অর্থ বাস্তুবিদ্যার সীমিত শর্তগুলি প্রজনন ক্রিয়ার উপরে আরোপিত হয় না। একটি পপুলেশনের সর্বোচ্চ জন্মের হার সাধারণত ধ্রুবক থাকে। বিজ্ঞানী Kerb (1972) খ্রিস্টাব্দে বলেন, জন্মের হার সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানবার পূর্বে প্রকৃত সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা (fertility) এবং তত্ত্বগতভাবে যত উৎপন্ন হতে পারে (fecundity) তার পার্থক্য আমাদের জানা আবশ্যক।

যেমন মানুষের পপুলেশনে সন্তান ধারণ করবার বয়সে প্রতি স্ত্রীলোকের গড়ে প্রতি পাঁচ বছরে একটি সন্তান জন্মায়। এটি পর্যবেক্ষিত তথ্য। কিন্তু ওই স্ত্রীলোকের 9–11 মাসে একটি সন্তান সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আছে। উপরের প্রথম ঘটনা fertility এবং পরের ঘটনা fecundity তা প্রমাণ করে।

Scanned by CamScanner

(খ) **বাস্তুবিদ্যায় ন্যাটালিটি (Ecological Natality) ঃ** একটি নির্দিষ্ট পরিবেশীয় অবস্থায় পপুলেশনের সংখ্যা বৃদ্ধিকে 'বাস্তুবিদ্যার ন্যাটালিটি' বলে। এটি কখনও ধ্রুবক থাকে না কারণ পপুলেশনের আকার, গঠন ও ফেকানডিটির উপর এটি নির্ভরশীল।

নিম্নলিখিত ফর্মুলার সাহায্যে জন্মের হার নির্ণয় করা যায়। যেমন, $B = \frac{Nn}{t}$ যেখানে B = জন্মের হার, Nn = পপুলেশনে নতুন সদস্য যোগদানের সংখ্যা এবং t = একক সময়। জন্মের হার প্রকৃতপক্ষে পপুলেশনের ঘনত্বের একটি কাজ অর্থাৎ সাধারণভাবে যদি পপুলেশনের ঘনত্ব অস্বাভাবিকভাবে কম হয় তা হলে জন্মের হারও কম হবে কারণ প্রজননের জন্য স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যাও কম হবে। পক্ষান্তরে পপুলেশনের ঘনত্ব যদি খুব বেশি হয় তা হলেও জন্মের হার কমে যায় কারণ সংখ্যাধিক্যের ফলে খাদ্যাভাব এবং নানা প্রকার শারীরবৃত্তীয় এবং মনোবৈজ্ঞানিক কাজের ত্রুটির সৃষ্টি হয়। সুতরাং সর্বাপেক্ষা অনুকূল অবস্থায় (optimum condition) জন্মের হারও সর্বাপেক্ষা বেশি।

(3) মৃত্যুর হার (Mortality) ঃ

সংজ্ঞা (Difinition) ঃ কোনো পপুলেশনের সদস্য সংখ্যার মৃত্যুকে মৃত্যুর হার (mortality) বলে। বাস্তুবিদ্যায় মর্টালিটি বলতে কোনো বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে পপুলেশন থেকে জীবের মৃত্যুকে বোঝায়।

বাস্তুবিদ্যায় 'মৃত্যুর হার' বলতে বোঝায় যে একক সময়ে পপুলেশনের সদস্যদের মধ্যে কতজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে অথবা চিরতরে পপুলেশন ত্যাগ করে চলে গেছে। নীচের ফর্মুলা দ্বারা মৃত্যুর হার নির্ণয় করা যায়।

যেমন, $D = \frac{Nd}{t}$ যেখানে D = মৃত্যুর হার, Nd = পপুলেশনে মৃত মানুষের সংখ্যা, t = একক সময়।

পপুলেশনের জন্মের হারের ন্যায় মৃত্যুর হারও পপুলেশনের ঘনত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। ঘনত্বের পরিমাণ যত বেশি হয় মৃত্যুর হারও তত বেশি হয় কারণ সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে খাদক প্রাণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়, রোগ বৃদ্ধি পায়, খাদ্যের সংকুলান হয় ইত্যাদি। আবার ঘনত্বের পরিমাণ অতিরিক্ত কমে গেলে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। কারণ বিপদ-আপদে অন্য সদস্যদের সহযোগিতা পাওয়া যায় না এবং কয়েকজনের পক্ষে ওই বিপদ অতিক্রম করাও সহজ হয় না। একটি উদাহরণের সাহায্যে এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মৌচাকে যদি মৌমাছির লার্ভাই একা একা থাকে তবে প্রচণ্ড শীতে তারা মরে যায়। কিন্তু এই সময় মৌমাছি দলবদ্ধভাবে চাকে বসে পরিস্ফুরিত লার্ভাদের প্রয়োজনীয় তাপের জোগান দেয়। এই সহযোগিতার ফলেই তারা বেঁচে যায়।

বিভিন্ন প্রজাতিতে এই মৃত্যুর হারও বিভিন্ন প্রকার এবং প্রাকৃতিক শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন—ঝড়ে পাখির বাসা ও ডিম নষ্ট হয় ফলে বহু শাবক বিনষ্ট হয়। তেমনি আগুন, বন্যা, প্রাণী শিকার, পিতা-মাতার মৃত্যু বা দুর্ঘটনার কারণে শাবক পরিত্যক্ত হয় অর্থাৎ প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যুর হার প্রজাতি হতে প্রজাতিতে পার্থক্য হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বসতি স্থানের বহন ক্ষমতা। বসতি স্থানের বহন ক্ষমতা অপেক্ষা যদি বেশি সদস্যযুক্ত হয় তবে অতিরিক্ত সদস্য হয় মরে যাবে অথবা চিরতরে ওই বাসস্থান ত্যাগ করে যাবে। কারণ বাস্তুবিদ্যায় কতজন মরে যাচ্ছে তা অপেক্ষা কতজন বেঁচে থাকছে তা প্রয়োজনীয়।

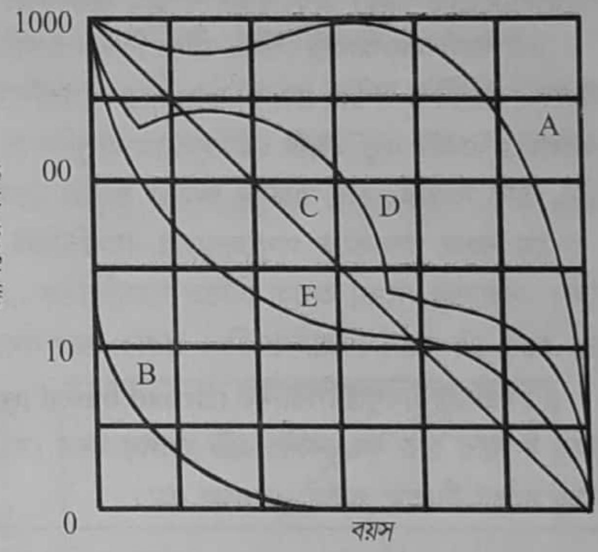

চিত্র ১ ঃ সারভাইভরশিপের লেখচিত্র (A) উত্তল, (B) অবতল, (C) কৌণিক, (D) সিঁড়ির ধাপ, (E) সিগময়েড কার্ভ।

আবার বিভিন্ন প্রজাতির সদস্য সংখ্যার মৃত্যুর বয়স বিভিন্ন প্রকার। যেমন—পতঙ্গের লার্ভা দশায় পরিণত প্রাণী অপেক্ষা মৃত্যুর হার অনেক বেশি। পাখির ক্ষেত্রেও শাবকের মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। ফলে বিভিন্ন প্রজাতির বয়সের গড়ে মৃত্যুর হার নির্ণয় করা হয় যা বাস্তুবিদার পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই গড়টি কয়েকটি লেখচিত্রের (graph) সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। এই লেখচিত্রগুলিকে survivorship curve বলে অথবা প্রজাতির লাইফটেবিল (lifetable) বলে। এই গ্রাফে x অক্ষে বয়স এবং y অক্ষে জীবিতের সংখ্যা স্থাপন করা হয়। এর ফলে লেখচিত্রগুলি নিম্নরূপ হয়। যেমন—(ক) **উত্তল** (খ) **অবতল** (গ) **কৌণিক** (ঘ) **সিঁড়ির ধাপ** এবং (ঙ) **সিগময়েড কার্ভ।**

Scanned by CamScanner

(A) **উত্তল (Convex)** ঃ যে সকল পপুলেশনে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুর হার খুব বেশি সেই সকল পপুলেশনের লেখচিত্র উত্তল হয়। মানুষ সহ অন্য বড়ো আকৃতির প্রাণী যাদের জীবনের শেষ প্রান্তে মৃত্যু বেশি হয়, তাদের মৃত্যুর হারে লেখচিত্র উত্তল হয়।

(B) **অবতল (concave)** ঃ এটি পূর্বেকার ঠিক বিপরীত। এই স্থলে অপরিণত বয়সে মৃত্যুর হার খুব বেশি, যেমন—ঝিনুক, শামুক, পতঙ্গ, জেলিফিস প্রভৃতিতে দেখা যায়।

(C) **কৌণিক (Diagonal)** ঃ মৃত্যুর হার যখন সকল বয়সে ধ্রুবক থাকে, যেমন— হাইড্রা এবং অনেক পাখিতে দেখা যায়।

(D) **সিঁড়ির ধাপ (Stair-step)** ঃ যখন জীবন ইতিহাসে বিভিন্ন পর্যায়ে বেঁচে থাকবার হার বিভিন্ন প্রকার হয়। যেমন—প্রজাপতি ও এদের ডিম ও লার্ভা এবং পিউপার মৃত্যুর হার কম কিন্তু পরিণত প্রাণী মাত্র কয়েকদিন বাঁচে।

(E) **সিগময়েড (Sigmoid)** ঃ যেখানে মৃত্যুর হার অপরিণত বয়সে খুব বেশি, ধীরে ধীরে বয়সের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে এবং পরিণত বয়সে প্রায় ধ্রুবক হয়। খরগোশ, ইঁদুর এবং পাখির ক্ষেত্রে এই প্রকার কার্ভ দেখা যায়।

(4) বয়সভিত্তিক বিস্তারণ (Age distribution) ঃ

একটি পপুলেশনে বিভিন্ন বয়স গ্রুপের, যেমন—অপরিণত, মধ্যবয়স্ক, বৃদ্ধবয়সের সদস্যরা জন্মের হার এবং মৃত্যুর হারের উপর প্রভাব বিস্তার করে। বিভিন্ন বয়সভিত্তিক গ্রুপের অনুপাত বর্তমানে ওই পপুলেশনের জনন ক্ষমতার ইঙ্গিত দেয়। এই ইঙ্গিত থেকে ভবিষ্যতের প্রজনন অবস্থা সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

উদাহরণস্বরূপ ঃ (১) অপরিণত বয়সের সদস্য সংখ্যা খুব বেশি হলে বুঝতে হবে পপুলেশনের আয়তন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। (২) যদি বয়সভিত্তিক বিস্তারণে সমতা থাকে তা হলে বুঝতে হবে পপুলেশন মোটামুটি অপরিবর্তনীয় আছে। (৩) যদি বয়স্কদের সংখ্যাধিক্য থাকে তবে বুঝতে হবে পপুলেশন ক্ষয়িষ্ণু হচ্ছে। প্রত্যেক পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য হল বয়সভিত্তিক বিস্তারণকে স্থায়ী রাখা কিন্তু নানা প্রাকৃতিক অস্বাভাবিক কারণে এই ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আবার স্থিতি লাভ করে।

বাস্তুবিদ্যার বয়স (Ecological age) ঃ

একটি পপুলেশনে তিনটি ইকোলজিক্যাল বয়স থাকে; যেমন—(১) **প্রাকজনন কাল** (Pre-reproductive) (২) **জননকাল** (reproductive age) এবং (৩) **পশ্চাৎ জননকাল** (post reproductive age)।

এই বয়সকাল আবার বিভিন্ন জীবে বিভিন্ন প্রকার। মানুষের যেমন তিনটি বয়সকাল প্রায় সমান, পতঙ্গের প্রাকপ্রজননকাল অনেক বেশি কিন্তু পশ্চাৎ প্রজনন কাল মাত্র কয়েকদিনের। পঙ্গপালের কয়েক বছর লাগে পরিণত হতে। কিন্তু পশ্চাৎ জননকাল কেবলমাত্র একটি ঋতু স্থায়ী হয়। সুতরাং বাস্তুবিদ্যায় এই ইকোলজিক্যাল বয়স খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মাধ্যমে পপুলেশনের গঠন, তার বিস্তার, তার প্রজনন ক্ষমতা প্রভৃতি জানা যায়।

যে সহজ পদ্ধতিতে পপুলেশনের বয়সভিত্তিক বিস্তারণ সম্বন্ধে জানা যায় তাকে **'বয়স পিরামিড'** (age pyramid) বলে। সদস্যের সংখ্যা অথবা বিভিন্ন বয়সভিত্তিক শ্রেণির শতকরা হিসাব পিরামিডের প্রশস্ততা ও অনুপ্রস্থ বার দ্বারা সূচিত করা হয়। এই বয়স পিরামিড তিন প্রকার হয়। যথা—

(১) **প্রশস্তভূমিযুক্ত পিরামিড (Broad based pyramid)** ঃ এই পিরামিড মাধ্যমে এটি জানা যায় যে এই প্রজাতির অল্পবয়স্ক সদস্য সংখ্যার হার খুব বেশি। এটি জ্ঞাপন করে যে এই পপুলেশন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বয়ঃক্রমের প্রতি উচ্চতর পর্যায়ে সদস্য সংখ্যা নিম্নের পর্যায় অপেক্ষা কম।

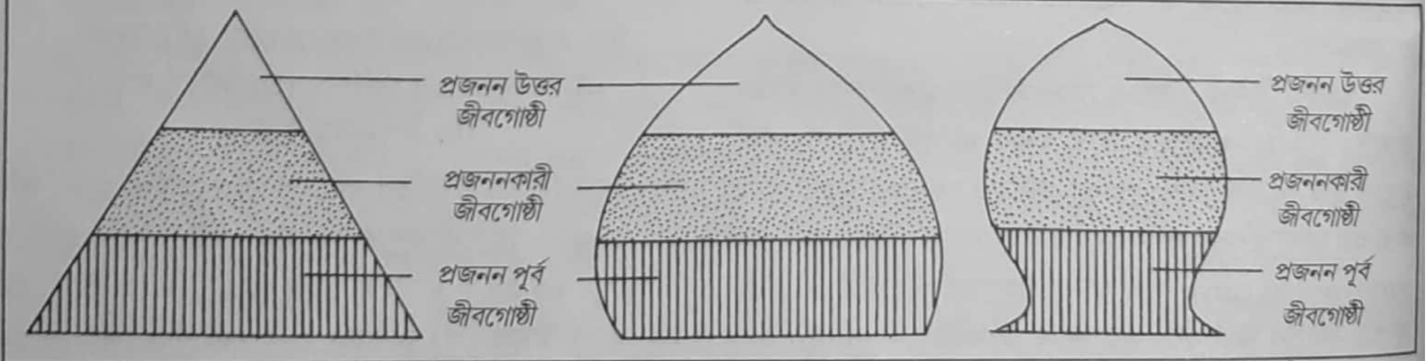

চিত্র ২ (ক) ঃ প্রশস্তভূমি পিরামিড। (বর্ধমান পিরামিড)
চিত্র ২ (খ) ঃ ঘণ্টাকৃতি পিরামিড। (স্থিতিশীল পিরামিড)
চিত্র ২ (গ) ঃ কলশাকৃতি পিরামিড। (ক্রমহ্রাসমান পিরামিড)

Scanned by CamScanner

(২) **ঘণ্টাকৃতি পিরামিড (Bell shaped pyramid) ঃ** এটি জ্ঞাপন করে যে এই পপুলেশনে অল্পবয়স্ক থেকে শুরু করে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত সদস্য সংখ্যার মাত্রা সীমাবদ্ধ। এই পপুলেশনটি স্থায়ী এবং এর ন্যাটালিটি = মর্টালিটি।

(৩) **কলশাকৃতি পিরামিড (Urn shaped pyramid) ঃ** এই পিরামিডের সাহায্যে আমরা জানতে পারি যে অল্প বয়স্কদের সংখ্যা কম, পপুলেশনের ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুর হার জন্মের হার থেকে অনেক বেশি।

(5) পপুলেশনের বৃদ্ধি এবং হার (Growth form and rate of population) ঃ

একটি পপুলেশনের মুখ্য এবং গতিময় বৈশিষ্ট্য হল তার বৃদ্ধি। যে বৈশিষ্ট্যময় পদ্ধতিতে পপুলেশন বৃদ্ধি পায় তাকে পপুলেশনের বৃদ্ধি (growth form) বলে। যখন কোনো অনধিকৃত অঞ্চলে কয়েকটি জীবকে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন প্রথমে তার বৃদ্ধির হার ধীর গতিতে (positive accleration phase) হয় তার পর দ্রুতলয়ে বৃদ্ধি পায় (logarithmic phase) এবং পরিশেষে যত পরিবেশীয় বাধার সৃষ্টি হয় তত বৃদ্ধির হার হ্রাস পায় (negative accleration phase) এবং ধীরে ধীরে সাম্যাবস্থায় পৌঁছায় এবং এই সময় পরিবেশীয় বাধাগুলি ধ্রুবক থাকে। সুতরাং যে সাম্যাবস্থার পর পপুলেশনের আর উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পায় না তাকে **সম্পৃক্ত অবস্থা** (saturated condition) এবং একে বাসস্থানের **বহন ক্ষমতা** (carrying capacity) বলে।

বৃদ্ধির লেখচিত্র (Population growth curve) ঃ

যদি সময়কাল x–অক্ষে এবং সদস্যের সংখ্যা y–অক্ষে করা হয় তা হলে যে লেখচিত্র গঠিত হয় তাকে পপুলেশনের বৃদ্ধির লেখচিত্র বা গ্রাফ বলা হয়। সাধারণত দুটি মুখ্য বৃদ্ধির গ্রাফ পাওয়া যায় যেমন—(১) **J আকৃতির বৃদ্ধির কার্ভ** (J-shaped growth form curve) এবং (২) **সিগময়েড আকৃতির বা S আকৃতির বৃদ্ধির কার্ভ** (Sigmoid growth curve or S shaped growth from curve)।

(১) J আকৃতির কার্ভের ব্যাখ্যা (Explanation of J-shaped curve) ঃ

যখন জীববিহীন কোনো অঞ্চলে কয়েকটি জীবকে কোনো ঋতুর প্রাক্কালে ছেড়ে দেওয়া হয় তখন পপুলেশনের বৃদ্ধির হার চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকে। এই বৃদ্ধির হার যখন শেষ সীমায় পৌঁছায় তখন পরিবেশীয় বাধাগুলি সক্রিয় হয় তখন পপুলেশনের বৃদ্ধি অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায় ফলে ঘনত্বের পরিমাণ নিদারুণভাবে কমে যায়। প্রকৃতিতে এই প্রকার গ্রাফ পাওয়া যায় শৈবালের বৃদ্ধি, একবৎসর কাল জীবিত থাকে এমন উদ্ভিদ, অধিকাংশ পতঙ্গের বৃদ্ধি, গোলাপ ফুলের পরজীবী থ্রিপসের (thrips) বৃদ্ধি প্রভৃতিতে। যে-কোনো পপুলেশনের J আকৃতির বৃদ্ধি নীচের ফর্মুলার সাহায্যে ব্যক্ত করা যায়। যেমন— $\frac{dN}{dt} = rn$ যেখানে $\frac{dN}{dt}$ পপুলেশনের বৃদ্ধির হার, d = ঘনত্ব, r = আপেক্ষিক ঘনত্ব, t = সময়কাল, N = সদস্য সংখ্যা যা সীমিত, n = বৃদ্ধির হার।

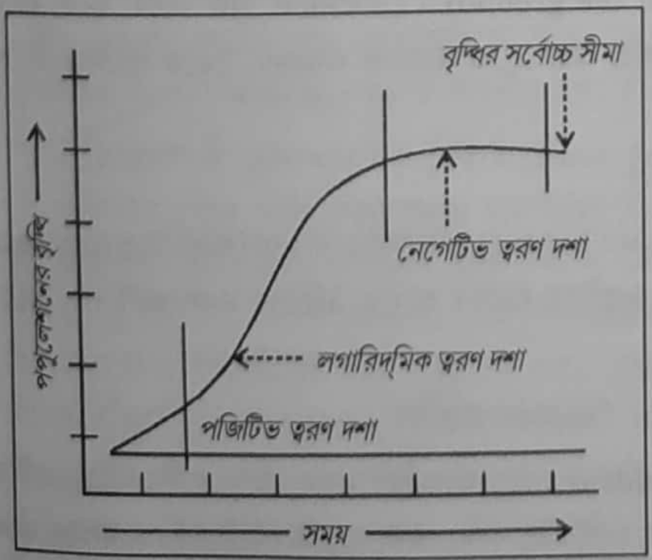

চিত্র ৩ ঃ পপুলেশন বৃদ্ধির কার্ভের বিভিন্ন দশা।

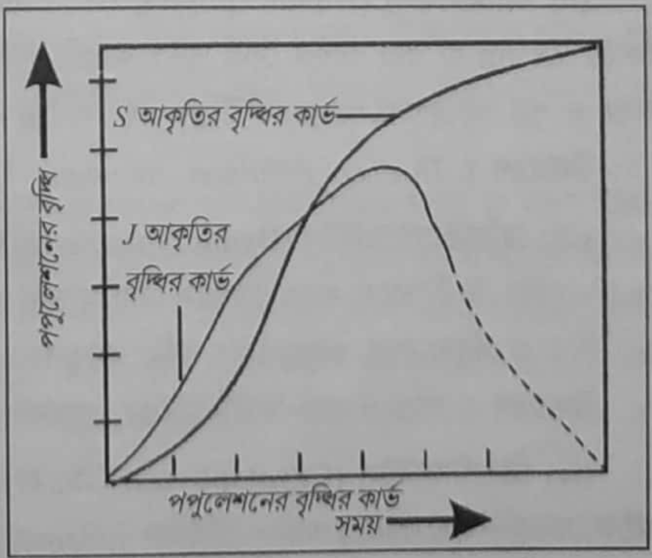

চিত্র ৪ ঃ J-আকৃতির এবং S-আকৃতির বৃদ্ধির কার্ভ।

Scanned by CamScanner

(2) সিগময়েড বৃদ্ধি কার্ভ (Sigmoid growth curve) ঃ

পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতিতে অনধিকৃত অঞ্চলে কয়েকটি জীব ছেড়ে দিলে প্রথমে ধীরে বৃদ্ধি, পরে দ্রুতলয়ে এবং পরিবে বাধা বৃদ্ধির ফলে পরিশেষে খুব ধীরে বৃদ্ধি পায় এবং সাম্যাবস্থা বজায় রাখে এবং এই উপাদানগুলি গ্রাফে স্থাপন কর একটি S আকৃতির লেখচিত্র পাওয়া যায় যাকে **সিগময়েড কার্ভ** বলে। এই প্রকার কার্ভ পাওয়া যায় ঈস্টের ক্ষেত্রে, অন্য আণুবীক্ষনিক জীবের ক্ষেত্রে, উদ্ভিদে, বিভিন্ন প্রাণী এবং মানুষের ক্ষেত্রে। সিগময়েড বৃদ্ধির কার্ভও একটি ফর্মূলার সাহা নির্ণয় করা যায়।

যেমন— $\frac{dN}{dt} = rn\left(1-\frac{N}{K}\right)$, যেখানে K = সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত পপুলশেনের আকার, যার উপর পপুলেশনের অ বৃদ্ধি সম্ভব নয়। d, N, t, r প্রভৃতি J আকৃতির কার্ভের ন্যায় বিভিন্ন উপাত্ত।

বহু বাস্তুবিদ উদ্ভিদদের বৃদ্ধির প্রকার (growth forms) এবং জীবনের প্রকার (life forms) এবং সেই সঙ্গে এদের কি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও বাসস্থানের ওপর নির্ভর করে শ্রেণিবিভাজনের চেষ্টা করেন। 1900 খ্রিস্টাব্দে Pound ও Clements উদ্ভিদে শ্রাব (shurbs) বা গুল্ম, হার্ব (herbs) বা ঔষধি এবং বৃক্ষ (trees) এই তিনটি প্রধান ভাগে বিভাজিত করেন। পরবর্তী পর্যা এই তিনটি প্রধান ভাগ থেকে কয়েকটি উপবিভাগ তৈরি করেন। যেমন—সূঁচের মতো পাতাযুক্ত চিরসবুজ, চওড়া–পাতা যু চির–সবুজ, চওড়া পত্রযুক্ত পর্ণমোচী, কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ ও গুল্ম, ছোটো ছোটো ঝোপ, ফার্ণ, ঘাস, মস, লিভারওয়ার্ট (liverworts) লাইকেন, ছত্রাক, শৈবাল প্রভৃতি।

এরপরে Christen Raunkiaer নামক উদ্ভিদবিদ 1903 ও 1934 খ্রিস্টাব্দে অনেক বিস্তৃত শ্রেণিবিন্যাস করেন। এ শ্রেণিবিন্যাসে কেবলমাত্র বৃদ্ধির প্রকারকে বিবেচনা করা হয়নি; সেই সঙ্গে ভ্রূণজ বা ভাজক কলা যারা শীতকালে নিষ্ক্রিয় থাকে কিন্তু শুষ্ক সময়ে মাটির ওপরে মাথা তুলে বেরিয়ে আসে সেই সকল বৈশিষ্ট্যও বিচার করা হয়েছিল। যে সকল কলায় আপদকালীন খাদ্য সঞ্চিত থাকে অর্থাৎ **পেরিনেটিং কলা** (perennating tissues) দের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। পেরিনেটিং কলার (perennating tissue) মধ্যে আছে মুকুল, বাল্ব, টিউবার, মূল ও বীজ। Raunkiaer জীবনের প্রকার ব্যাখ্যা করতে পাঁচটি নীতির বিশেষ উল্লেখ করেন। একটি গোষ্ঠীর সকল প্রকার প্রজাতিকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিভাজিত করেন। এই এবং এদের অনুপাত শতকরা পদ্ধতিতে নির্ণয় করার কথা বলেন। এই পাঁচটি শ্রেণি হল এইরূপ ঃ

(i) ফ্যানারোফাইটস্ (Phanerophytes, Gk. *Phaeros* = visible) ঃ পেরিনিয়াল (perennial) মুকুল মৃত্তিকা ভেদ করে বায়ু মাধ্যমে অনেকটা বেরিয়ে আসে। ফলে বিভিন্ন প্রকার আবহাওয়ার সন্মুখীন হয়। যেমন—বৃক্ষ ও গুল্ম যাদের দৈর্ঘ্য 25cm–এর অধিক; পরিবেশ স্যাঁতসেঁতে উষ্ণ পরিবেশ। কাষ্ঠাল লতা, পরগাছা এবং রসালো কাণ্ডযুক্ত উদ্ভিদ (যেমন—ক্যাকটাস) ফ্যানারোফাইটস্রে উপবিভাগ।

(ii) ক্যামিফাইটস্ (Chamaephytes, Gk. *Chamai* = on the ground) ঃ পেরিনিয়াল কাণ্ড অথবা মুকুল মাটির ওপরে 25 cm বা তার অধিক দৈর্ঘ্য পর্যন্ত আকৃতি বিশিষ্ট। মুকুলেরা ঝরাপত্র ও বরফের আচ্ছাদন থেকে সুরক্ষিত থাকে। ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া অঞ্চলের উদ্ভিদ এই বৈশিষ্ট্য দেখায়।

উদাহরণ ঃ *Thymus, Trifolium, Rhamnus,* Draba etc.।

(iii) হেমিক্রিপ্টোফাইটস্ (Hemicryptophytes Gk. *Krypos* : hidden) ঃ সংবৎসরজীবি বা পেরিনিয়াল (perennial buds) ভূমির উপরিভাগে থাকে সেখানে এরা মৃত্তিকা ও পত্রদ্বারা সুরক্ষিত থাকে। অনেক উদ্ভিদের নকশাকাটা পত্র থাকে। এরা শীত ও স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার জন্য অনুকূল।

উদাহরণ ঃ ঘাস ও হার্ব জাতীয় উদ্ভিদ, যেমন—*Fragaria, Primula* প্রভৃতি।

(iv) ক্রিপ্টোফাইটস্ (Cryptophytes; Gk. *krypos* = hidden) ঃ সংবৎসরজীবি মুকুল, যারা মাটির নীচে প্রোথিত থাকে যেমন—বাল্ব (bulb) অথবা রাইজোম (rhizome)। **উদাহরণ ঃ** পিঁয়াজ, আদা, আলু প্রভৃতি। মাটির নীচে থাকার ফলে এরা পরিবেশের তাপ ও ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া **হাইড্রোফাইটস্** (hydrophytes), যাদের মুকুল জলের নীচে থাকে; **হ্যালোফাইটস্** (hetophytes) বা জলজ উদ্ভিদ; **জিওফাইটস্** (geophytes) বা স্থলজ উদ্ভিদ যাদের মুকুল মাটির নীচে থাকে।

Scanned by CamScanner

(v) থেরোফাইটস্ (Therophytes : Gk. *theros* = summer) ঃ একবর্ষজীবি এই উদ্ভিদ এক বছরের মধ্যেই বীজ থেকে পুনরায় বীজে পরিণত হয়। বর্ষজীবি যে সকল উদ্ভিদ প্রতিকূল পরিবেশে বীজ হিসাবে লুকিয়ে থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে উদ্ভিদে পরিণত হয়। যেমন—মরু উদ্ভিদ এবং তৃণভূমির উদ্ভিদ এই প্রকার।

প্রাণীদের জীব প্রকারভেদ (Life–forms of animals) ঃ

প্রাণীদের শ্রেণিবিন্যাস প্রধানত ট্যাক্সোনমি (taxonomy) বা শ্রেণিবিন্যাসের নিয়ম মেনে করা হয়। এতৎ সত্ত্বেও Remane (1952), Krivolutskii (1972) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের বিকল্প নিয়মে বিভাজিত করেছেন। যেমন—

(i) এনক্রাস্টিং প্রকার (Encrusting forms) ঃ এদের মধ্যে আছে মিষ্টি জলের ব্রায়োজোয়া (bryozoan) *Plumatella* এবং কিছু প্রকার স্পঞ্জ (sponges)।

(ii) কোরাল প্রকার (Coral forms) ঃ সকল প্রকার কোরাল।

(iii) রেডিয়েট প্রকার (Radiate forms) ঃ সিলেনটারেট (নিডারিয়া) ও কন্টকত্বক (echinoderms)।

(iv) বাইভালব প্রকার (Bivalve forms) ঃ ঝিনুক জাতীয় মোলাস্কা।

(v) স্নেল প্রকার (Snail forms) ঃ শামুক জাতীয় মোলাস্কা।

(vi) স্লাগ প্রকার (Slug forms) ঃ খোলকবিহীন মিউকাস ক্ষরণকারী শক্ত চামড়াযুক্ত মোলাস্কা।

(vii) ওয়ার্ম প্রকার (Worm forms) ঃ ক্রিমি, কেঁচো ও কীট জাতীয় প্রাণী।

(viii) ক্রাস্টেসিয়ান প্রকার (Crustacean forms) ঃ চিংড়ি জাতীয় প্রাণী।

(ix) ইনসেক্ট প্রকার (Insect forms) ঃ পতঙ্গ জাতীয় প্রাণী।

(x) মৎস, সর্প, পক্ষী এবং চতুষ্পদযুক্ত প্রকার (Fish, Snakes, Birds and Four–footed forms) ঃ Osburn *et al.*, চতুষ্পদযুক্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করেছেন। যেমন ঃ

(a) **জলজ (Aquatic বা swimming) ঃ উদাহরণ ঃ** Seal, Whale, Walrus।

(b) **ফসোরিয়াল (Fossorial বা burrowing) ঃ উদাহরণ ঃ** Mole, Shrew।

(c) **কারসোরিয়াল (Cursorial বা running) ঃ উদাহরণ ঃ** Deer, Antilope, Zebra।

(d) **সালটোরিয়াল (Saltorial বা leaping) ঃ উদাহরণ ঃ** Rabbit, Kangaroo।

(e) **স্ক্যানসোরিয়াল (Scansorial বা climbing) ঃ উদাহরণ ঃ** Squirrel, Monkey।

(f) **অ্যারিয়াল (Aerial বা flying) ঃ উদাহরণ ঃ** বাদুড় (Bats)।

(6) পপুলেশনের বিস্তার (Dispersion of population) ঃ

উৎপত্তি স্থান থেকে চারদিকে পরিযাণ করা প্রজাতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য। খাদ্য, আশ্রয়, জীবনসঙ্গিনীর খোঁজ, অনধিকৃত অঞ্চলে অধিকার স্থাপন করা, প্রতিযোগিতা থেকে মুক্তি পাওয়া প্রভৃতির কারণে প্রজাতির সদস্যরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে যতক্ষণ না কোনো অনতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হয়। প্রজাতির এই বিস্তারকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

এমিগ্রেশন বা দেশান্তরমূলক বিস্তার (Emigration) ঃ

প্রজাতির বৃদ্ধির ফলে সদস্য সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় এবং বসতিস্থানের বহন ক্ষমতা আর থাকে না তখন সদস্যরা দেশান্তরমূলক বিস্তারে বের হয় কারণ এতে কোনো বসতি স্থানে প্রজাতির সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বসতিস্থানের অতিরিক্ত শোষণ বন্ধ হয়। এই বিস্তার প্রজাতির অভিযোজনজনিত ব্যবহার। নতুন স্থানে এমিগ্রেশনের ফলে একই প্রজাতির দূরবর্তী সদস্যদের মধ্যে ইন্টারব্রিডিং হওয়ার সুযোগ থাকে ফলে আরও বেশি হেটারোজাইগাসের সৃষ্টি হয় যা অভিযোজনের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পপুলেশন বৃদ্ধির চাপের ফলেই অল্পবয়স্কদের ইমিগ্রেশন ঘটে এবং নতুন নতুন অঞ্চল অধিকৃত হয়।

অভিবাসন বা ইমিগ্রেশন (Immigration) ঃ

অভিবাসনের ফলে পপুলেশনের বৃদ্ধি ঘটে এবং এত সংখ্যাধিক্য ঘটে যা বসতিস্থানের বহন ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। ফলে অভিবাসিত সদস্যদের মধ্যে মৃত্যুর হার বেশি হয় অথবা সদস্যদের প্রজনন ক্ষমতার হ্রাসকরণ ঘটে। আবহাওয়া এবং জৈব ও অজৈব শর্তাবলির ফলেই ইমিগ্রেশন এবং এমিগ্রেশন উভয়ই ঘটে।

Scanned by CamScanner

পরিযাণ (Migration) ঃ

সমগ্র পপুলেশনটির নিজস্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র গমনকে **পরিযাণ** করে। প্রজাপতি, ড্রাগন ফ্লাই, ইল মাছ এবং কিছু স্তন্যপায়ী পপুলেশনে এই প্রকার পরিযাণ লক্ষ করা যায়। **পরিবেশীয় পর্যাবৃত্তি** (periodicity) এই প্রকার পরিযাণ নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন দিন ও রাত্রির পরিবর্তন, চন্দ্র-পর্যায়, জোয়ার–ভাঁটা, ঋতু পরিবর্তন প্রভৃতি পরিবেশীয় পর্যাবৃত্তি। মনার্ক প্রজাপতি একই পথে শীতকালে বহুদূর পর্যন্ত দল বেঁধে পরিযাণ করে আবার বসন্তকালে নিজের বসতিস্থানে ফিরে আসে। খাদ্য, আশ্রয় ও স্বাভাবিক প্রজননের জন্য প্রাণী পরিযাণ করে অনধিকৃত স্থানের প্রাকৃতিক খাদ্য ভাণ্ডার এদের পরম উপকারে লাগে। পাখির পরিযাণও কিংবদন্তি। খাদ্য, আশ্রয় ও প্রজননের জন্য তারা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে। স্যালমন ও ইল মাছ এভাবে পরিযাণ করে। ইল মাছ সমুদ্র মোহানার মাছ কিন্তু ডিম পাড়বার জন্য এই নদী থেকে সমুদ্রে কয়েক হাজার মাইল পরিযাণ করে। এদের **ক্যাটাড্রোমাস মাছ** (Catadromous fish) বলে। ডিম পাড়বার পর পরিণত মাছ মরে যায়। শিশু ইল মাছ তিন বছর ধরে সাঁতার কেটে সমুদ্র থেকে আবার নদীতে ফিরে আসে। তেমনি স্যালমন মাছ (Salmon fish) প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ডিম পাড়বার জন্য নদীতে পরিযাণ করে। এদের তাই **অ্যানাড্রোমাস মাছ** (Anadromous fish) বলে। আমাদের অতি পরিচিত সুস্বাদু ইলিশ মাছ একপ্রকার অ্যানাড্রোমাস মাছ।

(7) পপুলেশনের আকার বা জীবসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ (Regulation of population size or Control of Population) ঃ

বহন ক্ষমতা (Carrying capacity) ঃ

কম জীববৈচিত্র্য সম্পন্ন, ভৌতিক সমস্যা সঙ্কুল বাস্তুতন্ত্রে অথবা এমন বাস্তুতন্ত্র যেখানে অনিশ্চিত অথবা অজানা বাহ্যিক অস্থিরতা থাকে, সেখানে জীবসংখ্যা প্রধানত ভৌতিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। ভৌতিক কারণগুলির মধ্যে আছে আবহাওয়া, জলস্রোত, রাসায়নিক পরিমণ্ডল এবং প্রদূষণ।

সংজ্ঞা (Definition) ঃ

কোনো একটি পরিবেশে একটি জীব প্রজাতির বহন ক্ষমতা বলতে বোঝায় পরিবেশের কোনো প্রকার ক্ষয়ক্ষতি ব্যতীত প্রজাতির কত বেশি সংখ্যা সেই পরিবেশে বাস করতে পারে। অর্থাৎ কোনো একটি পরিবেশ প্রজাতির কত বেশি সংখ্যক সদস্যদের খাদ্য, বাসস্থান এবং অন্যান্য সুবিধা দিয়ে লালনপালন করতে সক্ষম সেই ক্ষমতাকে।

সাধারণ পরিবেশে অর্থাৎ যেখানে ভৌতিক চাপ এবং সময়ে সময়ে ঝড় কিম্বা অগ্নির মাধ্যমে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম থাকে, সেখানে জীবসংখ্যা মোটামুটিভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকে অর্থাৎ তাদের ঘনত্ব অনেকটা পরিমাণে স্বনিয়ন্ত্রিত (self–regulated) হয়।

যে–কোনো উপাদান যা জীবসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রিত করে কিম্বা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে তা দুই প্রকার হয়ে থাকে। যেমন—(i) **ঘনত্ব নিরপেক্ষ** (density independent) এবং (ii) **ঘনত্ব নির্ভর** (density dependent)।

(i) ঘনত্ব নিরপেক্ষ উপাদান (Density independent Components) ঃ যখন কোনো উপাদানের প্রভাব জীবের ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে না তখন তাদের ঘনত্ব নিরপেক্ষ বলা হয়। আবহাওয়ার প্রভাব যেমন—তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি জীবের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। এছাড়া জীবের জন্ম ও মৃত্যু হারের মতো ঘটনা দুটিও পপুলেশনের মোট সদস্য সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না।

(ii) ঘনত্ব নির্ভর উপাদান (Density dependent Components) ঃ এই উপাদানগুলি জীবের ঘনত্বের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রকার উপাদানের প্রভাব জীব ঘনত্বের ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রতিভাত হয়। এই জীবসংখ্যা যত বহন ক্ষমতার কাছাকাছি আসে এদের প্রভাব ততই অধিক হয়ে থাকে। এছাড়া জৈবিক ঘটনাবলী যেমন—প্রতিযোগিতা, পরজীবি কিম্বা জীবাণুর প্রভাব সাধারণত জীব ঘনত্বের ওপর নির্ভরশীল। জন্ম ও মৃত্যুহার, জীবের পরিযান প্রভৃতি ঘটনাবলী জীবের ঘনত্বের ওপর প্রভাবশীল। জীব ঘনত্ব যত বৃদ্ধি পায় জনসংখ্যা তত হ্রাস পায় এবং মৃত্যুহার বেড়ে যায়। একটি বড়ো সংখ্যক জীব যদি অন্যত্র সরে যায় তার প্রভাবও জীব ঘনত্বের ওপর পড়ে।

আলোচনা (Discussion) ঃ ঘনত্ব নিরপেক্ষ উপাদানগুলি পপুলেশনের আকার নির্ধারণ না করলেও পপুলেশনের আকার নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা পালন করে। ঘনত্ব নির্ভর উপাদানের প্রভাবে জীবসংখ্যার আকার নির্ধারিত হয়। জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধি হলে

Scanned by CamScanner

খাদ্য, বাসস্থান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রির সংকট সৃষ্টি হয় ফলে জীবসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ঘনত্ব নিরপেক্ষ বা বাহ্যিক উপাদানের প্রভাবে **J–আকৃতির বৃদ্ধি কার্ভ** তৈরি হয়। কিন্তু ঘনত্ব নির্ভর বা অভ্যন্তরিন উপাদানের প্রভাবে **সিগময়েড বৃদ্ধি** কার্ভ তৈরি হয় (চিত্র–৩ ও ৪)।

❑ জিওমেট্রিক, এক্সপোনেনশিয়াল ও লজিস্টিক বৃদ্ধি (Geometric, Exponential and Logistic growth) ঃ

সূচনা (Introduction) ঃ

বৃদ্ধি সকল জীবের অন্যতম ধর্ম। জড় বস্তুর বৃদ্ধি হয় না, হলেও তা হয় ওই বস্তুর বহির্ভাগে। কিন্তু সজীব বস্তুর বৃদ্ধি হয় ভিতরের দিক থেকে। বৃদ্ধি প্রধানত দুই প্রকার; যথা—কোশের বৃদ্ধি এবং বংশবৃদ্ধি। যে সকল জীবের দেহ একটি মাত্র কোশ নিয়ে গঠিত তাদের কোশটি সাধারণত অযৌন জনন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে নতুন জীব গঠন করে। বহুজীবি উদ্ভিদ এবং প্রাণীর কোশ বিভাজনের মাধ্যমে দেহের কোশ সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। এতে দেহের আকৃতি বৃদ্ধি পায়। উদ্ভিদ ও প্রাণীরা জনন কোশ তৈরি করে। স্ত্রী ও পুং জনন কোশ মিলিত হয়ে তৈরি হয় নিষিক্ত ডিম্বকোশ (zygote)। এই ডিম্বকোশ বিভাজিত হয়ে তৈরি করে নতুন উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণী। এইভাবে জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে। তবে উদ্ভিদ ও প্রাণীদের দৈহিক বৃদ্ধির মধ্যে পার্থক্য আছে। সাধারণত উন্নত প্রাণীরা বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্ক রেখে একটি নির্দিষ্ট দৈহিক আকৃতি পায়। একবার পরিণত আকৃতি পাবার পরে প্রাণীদের দৈহিক আকৃতির বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু উদ্ভিদের বৃদ্ধি চলে সারাজীবন। যদিও বৃদ্ধি হার বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে কমে যায়।

বর্তমানে আলোচনায় কেবলমাত্র প্রাণীদের বংশবৃদ্ধির বিষয়টির বিভিন্ন দিক উল্লেখিত হবে। প্রাণীরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, জলে, স্থলে, মরুভূমিতে বাস করে। এই বাসস্থানের ভৌতিক পরিবেশ বিভিন্ন প্রকার। পরিবেশের আবহাওয়াও সারা বছর একপ্রকার থাকে না। তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, খাদ্যের প্রাপ্যতা স্থানে স্থানে ভিন্ন প্রকার হয়। অর্থাৎ পরিবেশ কখনো কখনো প্রাণীদের বংশ বৃদ্ধির অনুকূল হয় আবার কখনো কখনো প্রতিকূল হয়ে থাকে। এই সকল কারণে প্রাণীদের বৃদ্ধির হারের তারতম্য ঘটে থাকে। প্রাণীদের বৃদ্ধি **জিওমেট্রিক, এক্সপোনেনশিয়াল** ও **লজিস্টিক** এই তিনটি ভাবে ঘটে থাকে।

(ক) জিওমেট্রিক বৃদ্ধি (Geometric growth) ঃ

কোনো জীবগোষ্ঠীর বংশ বৃদ্ধির হার অঙ্কের হারে অর্থাৎ 1, 2, 3, 4, 5 ....10 এই সিরিজে বৃদ্ধি না পেয়ে যদি 2, 4, 8, 16, 32 অর্থাৎ $(1 + x + x^2 + x^3 + ...)$ এই রূপ জ্যামিতিক সিরিজে বৃদ্ধি পায়, তবে একে **জিওমেট্রিক বৃদ্ধি** (geometric growth) বলে। জিওমেট্রিক বৃদ্ধি সর্বদাই একটি স্থায়ী অনুপাতে পরিবর্তিত হয়।

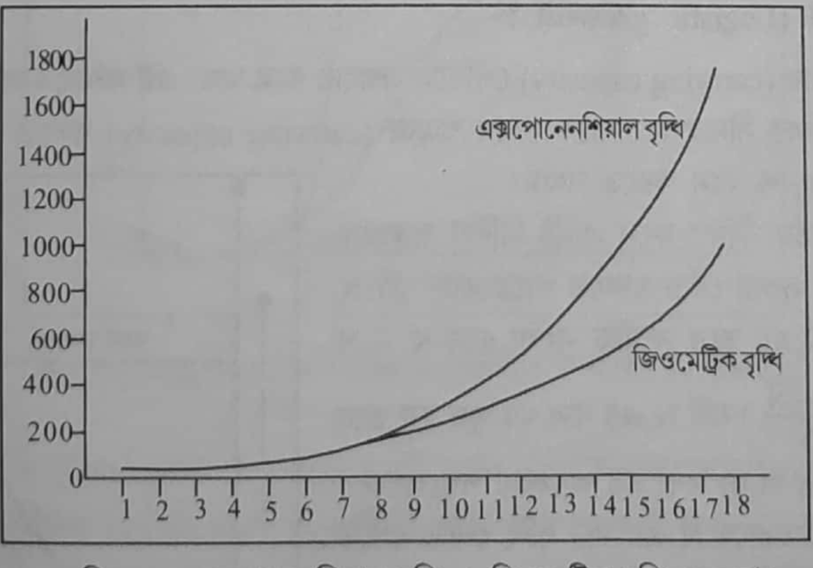

চিত্র ৫ ঃ এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি ও জিওমেট্রিক বৃদ্ধির তুলনা।

(খ) এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি (Exponential growth) ঃ

যদি কোনো জীবগোষ্ঠীর জন্মহার সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অপরিবর্তিত থাকে তবে সেই বৃদ্ধিকে **এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি** (exponential growth) বলে। এই প্রকার বৃদ্ধির উর্দ্ধসীমা থাকে না। বৃদ্ধির হার অপরিবর্তিত থাকায় সুবিধাজনক অবস্থায়

Scanned by CamScanner

(optimum conditions) জীবের সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধির যে দশায় গোষ্ঠীর সদস্য সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় তাকে **এক্সপোনেনশিয়াল দশা** (exponential phase) বলা হয়।

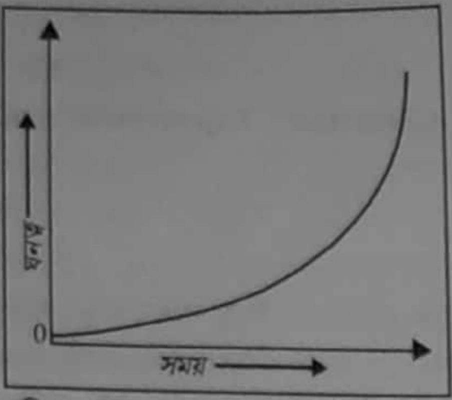

চিত্র ৬ ঃ এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি কার্ভ (r–স্ট্র্যাটেজি)।

এক্সপোনেনশিয়াল শব্দের অর্থ হল ব্যাখ্যামূলক অর্থাৎ যে পপুলেশনের বৃদ্ধির প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষণ করা যায় এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় সেই প্রকার বৃদ্ধিকে এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি বলে। যেমন—কোনো একটি অনধিকৃত অঞ্চলে কয়েকটি জীবকে ছেড়ে দেওয়া যায় তখন তাদের বৃদ্ধির হার সংখ্যাল্পতাহেতু ধীরগতিতে অগ্রসর হয়। এই ধীর গতির বৃদ্ধিকে বলা হয় Positive accleration দশা। এরপর সংখ্যা অতি দ্রুতলয়ে, বৃদ্ধি পায়; কারণ তখনও পরিবেশীয় বাধাগুলি সর্বোতভাবে সক্রিয় হয় না। এই দশাকে logarithmic দশা বলে। এইভাবে বৃদ্ধি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর পর পরিবেশীয় বাধাগুলি (যেমন—আশ্রয়, খাদ্য, রোগ, তাপ, শত্রু, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতি) অতি সক্রিয় হয় এবং পপুলেশনের সংখ্যা অতিদ্রুত অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। এই দশাকে negatiuve aceleration দশা বলা হয়।

পপুলেশনের যে বৃদ্ধিতে positive, logarithmic and negative ত্বরণ পর্যায় দেখা যায়; সেই প্রকার বৃদ্ধিকে এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি বলে।

Exponential বৃদ্ধিদশায় J–আকৃতির বৃদ্ধি কার্ভ পাওয়া যায়। পরীক্ষাগারে *Drosophila* মাছির জননের উপর সংগ্রহ করে বিশ্লেষণ করলে exponential বৃদ্ধির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মনে করি প্রতিটি স্ত্রী *Drosophila* মাছি 120টি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ডিম থেকে অপত্য সৃষ্টি হলে প্রতিটি স্ত্রীমাছি N × 120। একক জনুতে পপুলেশনের সদস্য সংখ্যার হারের পরিবর্তন হবে।

$\frac{dN}{dt} = 120N$ । যদি স্ত্রীমাছির সংখ্যা N = 60 হয় তবে $\frac{dN}{dt} = (120 \times 60) = 7200$ । সুতরাং বৃদ্ধির হার জনন ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল (এখানে r = 120) এবং স্ত্রীমাছির সংখ্যা = N সুতরাং বৃদ্ধির হার— $\frac{dN}{dt} = rN$ এবং এই সমীকরণটি হল exponential বৃদ্ধির সমীকরণ এবং এই বৃদ্ধি চলতে থাকে ততক্ষণ যতক্ষণ r অপরিবর্তিত থাকে, N – ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যদি পরিবেশ সীমাহীন থাকে, পপুলেশনে অন্যস্থান থেকে আগমন বা পপুলেশন থেকে নির্গমন না ঘটে তবে N = 120 হলে r = 60 অর্থাৎ একক জনুতে হবার কথা ছিল 7200 কিন্তু হয়েছে মাত্র 60 । এটিই হল exponential বৃদ্ধি এবং এর কার্ভ হল J–আকৃতির।

(গ) লজিস্টিক বৃদ্ধি (Logistic growth) ঃ

গোষ্ঠীর সংখ্যা বহন ক্ষমতায় (carrying capacity) পৌঁছলে জন্মহার কমে যায়। এই ঘটনাকে **লজিস্টিক বৃদ্ধি** (logistic growth) বলে। এই প্রকার বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতা থাকে। **বহন ক্ষমতা** (carrying capacity) বলতে জীবগোষ্ঠীর চূড়ান্ত সেই সংখ্যাকে বোঝায় যা তার পরিবেশ বহন করতে সক্ষম।

যেহেতু পরিবেশীয় পরিবর্তন সীমিত ফলে একটি নির্দিষ্ট বাস্তুতন্ত্রে পপুলেশনের যে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা বেঁচে থাকতে পারে তাহা যদি K হয় এবং বর্তমান সংখ্যা যদি N হয় তবে সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে K – N এবং পরিবেশীয় বাধা হবে $\frac{K - N}{K}$ । যদি N এর মান খুব ক্ষুদ্র হয় তবে পরিবেশীয় বাধা হবে শূন্য (zero বা 0) এবং এই অবস্থায় পপুলেশনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। বিপরীতভাবে N এর মান বৃদ্ধি পেতে পেতে N = K হয়, তবে বুঝতে হবে পরিবেশীয় বাধা বৃদ্ধি পেয়েছে। তখন পরিবর্তনের হার উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; যেমন—মনে করি K = 100 এর N = 10 সুতরাং r = 0.9 কিন্তু K = 100 এর N = 90 হলে r = 0.1।

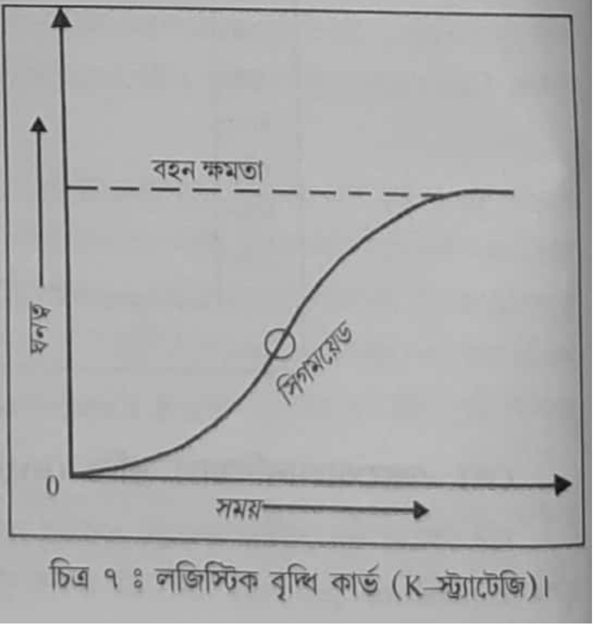

চিত্র ৭ ঃ লজিস্টিক বৃদ্ধি কার্ভ (K–স্ট্র্যাটেজি)।

Scanned by CamScanner

$\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$ এবং এই সমীকরণে N যদি খুব ক্ষুদ্র হয়; তবে r = 0 এবং তখনই প্রজনন পদ্ধতি অতি সক্রিয় হয়।

সাধারণত r এর মান মোটামুটি স্থায়ী হয় তখন পপুলেশনের সংখ্যার সামান্য বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু N যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে পপুলেশনের আকৃতি হ্রাস পায়। ফলে K–এর খুব বেশি পরিবর্তন হয় না। সুতরাং $\frac{dN}{dt} = rN\left(\frac{K-N}{K}\right)$ হল লজিস্টিক সমীকরণ (Logistic equation)।

এখানে K = বহন ক্ষমতা (carrying capacity), r = মাথা পিছু পপুলেশনের বৃদ্ধির হার (per capita growth rate of population)।

(ঘ) বিভিন্ন গ্রোথ কার্ভের পার্থক্য (Differences among various growth curves) ঃ

(i) এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি (Exponential growth) ঃ এক্ষেত্রে প্রতিটি জীব প্রজাতি অবিরত প্রজনন করে চলে, ফলে প্রজন্ম বহন সীমারেখা অতিক্রম করে। এই কারণে এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধিকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে জীবসংখ্যার আকারের পরিবর্তনকে বোঝায়। এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধির কার্ভটি সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সর্বদা উর্দ্ধমুখী বৃদ্ধি পায়।

এর সমীকরণ (equation) হল ঃ এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি = $\frac{dN}{dt} = rN$

এখানে, N = পপুলেশনের ঘনত্ব, t = সময় এবং r = মাথা পিছু (per capita) বৃদ্ধির হার।

(ii) লজিস্টিক বৃদ্ধি (Logistic growth) ঃ এক্ষেত্রে পপুলেশনের সংখ্যা প্রথমে দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু বহন ক্ষমতায় (carrying capacity) পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধির হার কমে স্থিতাবস্থায় আসে। এখানে পরিবেশে সম্পদের অভাব বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এর সমীকরণ (equation) হল ঃ লজিস্টিক বৃদ্ধি = $\frac{dN}{dt} = rN\left(1-\frac{N}{K}\right)$

এখানে, N = পপুলেশনের ঘনত্ব, t = সময়, r = মাথা পিছু (per capita) বৃদ্ধির হার, K = বহন ক্ষমতা (carrying capacity)।

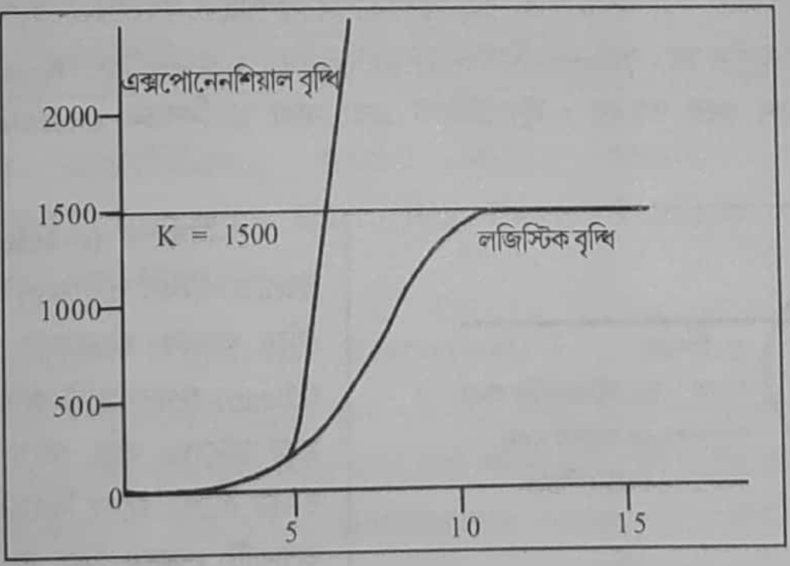

চিত্র ৮ ঃ এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি ও লজিস্টিক বৃদ্ধি কার্ভের তুলনা।

(iii) জিওমেট্রিক বৃদ্ধি (Geometric growth) ঃ এই প্রকার বৃদ্ধিতে পর্যায়ক্রমে পপুলেশনে একটি স্থায়ী অনুপাতে পরিবর্তন ঘটে যা **অ্যারিথমেটিক** (arithmetic) পরিবর্তনের মতো সমহারে ঘটে না।

যে পরিবেশে জীব বাস করে সেই বাসস্থানে সম্পদের প্রাচুর্য্য থাকলে জীবের জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি ঘটে। এই বৃদ্ধি তখন এক্সপোনেনশিয়াল বৃদ্ধি বলে ধরা হয়।

Scanned by CamScanner

সূচনা (Introduction) :

কোনো কোনো ভূতাত্ত্বিককালে অবস্থিত সে সময়ের জীব প্রজাতি এমন পরিবেশের সম্মুখীন হয়েছিল যখন তাদের বেঁচে থাকার জন্য দুটি রাস্তা খোলা ছিল। যেমন—পরিস্থিতি যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকে এগিয়ে যাওয়া অথবা বিকল্প সুস্থির পরিবেশের খোঁজ করা।

অস্থির পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য সেই প্রজাতিকে বহু সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করতে হতো। এদের মধ্যে বেশ কিছু সন্তানের জন্য ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ হতো কম, তাই এদের **কম মূল্যবান** (cheap) প্রজন্ম বলা হয়। অতিমাত্রায় সন্তান উৎপাদনের ফলে প্রতিকূল পরিবেশে বহু সংখ্যক সন্তানের মৃত্যু ঘটলেও কিছু সংখ্যক প্রজননক্ষম সন্তান বেঁচে থাকত; যারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করতে সক্ষম হতো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বিশেষতঃ অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা এই ব্যবস্থা অনুসরণ করেছিল।

বিকল্প পথ অর্থাৎ সুস্থির পরিবেশে অভিযোজনের জন্য প্রয়োজন হত **অল্পসংখ্যক মূল্যবান** (expensive) সন্তান তৈরি করা। সংখ্যায় কম হলেও এরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে সক্ষম হতো ফলে এদের প্রজননকাল হতো সুদীর্ঘ। এছাড়া পরিবেশ সুস্থির থাকায় এদের অপত্যের মৃত্যুহারও কম হতো। মানুষসহ অন্যান্য বড়ো আকারের প্রাণীরা এই কৌশল অবলম্বন করেছিল। উদ্ভিদের মধ্যেও এই কৌশল অবলম্বিত হয়েছে। কিছু কিছু উদ্ভিদ প্রতিকূল পরিবেশে যেমন—বন্য বিধৌত অঞ্চলে, পাহাড়ের ফাটলে কিম্বা অরণ্যে অন্য গাছের নীচে জন্মাতে অভ্যস্ত হয়েছিল। আবার অনেক উদ্ভিদ **ক্লাইম্যাক্স** (climax) অরণ্যের মতো সুস্থিত অঞ্চলে স্থান পেয়েছিল।

জীবদেহের সঞ্চিত শক্তিকে প্রধানত **প্রজনন শক্তি** (reproductive energy) ও **প্রতিপালন শক্তি** (maintenance energy) এই দুটি প্রধান ভাগে ব্যয়িত হতে দেখা যায়। প্রজনন শক্তি ও প্রতিপালন শক্তির অনুপাত কেবলমাত্র জীব প্রজাতির আকার ও জীবন ইতিহাসের পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে না সেই সঙ্গে জীব প্রজাতির ঘনত্ব (density) এবং বহন ক্ষমতার (carrying capacity) ওপরও নির্ভর করে।

পরিবেশে প্রজাতির সংখ্যা কম হলে নির্বাচন চাপ (selection pressure) সেইসব প্রজাতিকে সাহায্য করে যাদের প্রজনন ক্ষমতা বা দক্ষতা অধিক। অপরদিকে পরিবেশে প্রজাতির সদস্য সংখ্যা অধিক হলে নির্বাচন চাপ সেইসব প্রজাতিকে সাহায্য করে যাদের প্রজনন ও বৃদ্ধির দক্ষতা কম অথচ যারা ওই পরিবেশের সম্পদকে যথাযথভাবে খরচ করতে পারে। এইভাবে জীবগোষ্ঠী দু প্রকার নির্বাচনের সম্মুখীন হয়। যথা—r–নির্বাচন (r–selection) ও K–নির্বাচন (K–selection)। যে সকল প্রজাতি r–নির্বাচন (selection) অনুসরণ করে তাদের r–স্ট্র্যাটেজিস্ট এবং যারা K–নির্বাচন (selection) অনুসরণ করে তাদের K–স্ট্র্যাটেজিস্ট বলা হয়।

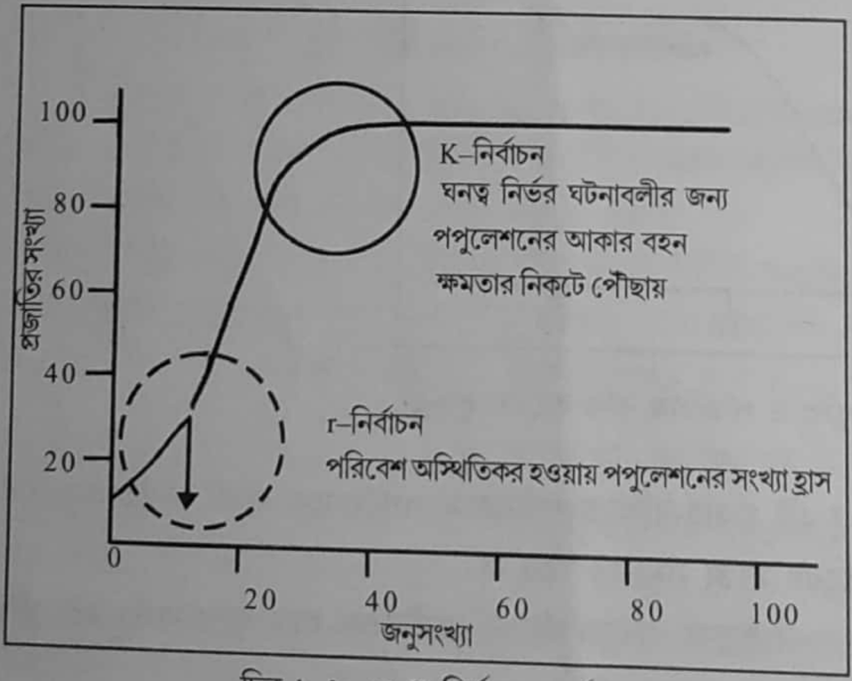

চিত্র ৯ : r ও K নির্বাচন কার্ভ।

r–নির্বাচন (r–selection) : যে সকল জীব প্রজাতি অস্থির পরিবেশে বাস করে তাদের বংশধরদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ব্যাপক সংখ্যায় নিম্নমানের (cheap) অপত্য সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে বহু অপত্যের মৃত্যু ঘটলেও যারা বেঁচে থাকে তারা প্রজাতির বংশ বজায় রাখে। এদের নির্বাচনকে r–selection বলে। r–অক্ষরটি প্রজনন হার বা reproductive rate কথা থেকে নেওয়া হয়েছে।

r–স্ট্র্যাটেজিস্ট (r–strategist) : অস্থির পরিবেশে যে জীব প্রজাতি থাকে তাদের বংশবৃদ্ধি সেই পরিবেশে প্রজাতির ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে না এক্ষেত্রে পপুলেশন পরিবেশের বহন ক্ষমতার (carrying capacity) নীচে থাকায় এদের বৃদ্ধি দ্রুতহারে (exponentially) ঘটে থাকে। যেহেতু এই সকল জীব প্রজাতির বৃদ্ধি প্রতিকূল পরিবেশে মানিয়ে চলার উপযুক্ত তাই এই প্রজাতিদের r–স্ট্র্যাটেজিস্ট বলে।

Scanned by CamScanner

K–নির্বাচন (K–selection) : বাস্তুবিদ্যায় K–নির্বাচন বলতে সেই ঘটনাকে বোঝায় যেখানে একটি পপুলেশন তার বহন ক্ষমতার (carrying capacity) খুব কাছে অথবা বহন ক্ষমতায় পৌঁছে যায়। অর্থাৎ পপুলেশনটি সাধারণত সুস্থির, এর সদস্যরা পরিবেশের সম্পদ সদ্ব্যবহার করতে সক্ষম এবং এরা স্বল্প সংখ্যক অপত্য সৃষ্টি করে। অপত্যরা ধীরে ধীরে পরিণত হয়ে কালক্রমে দীর্ঘজীবি সুস্থির পপুলেশনে পরিণত হয়।

K–স্ট্র্যাটেজিস্ট (K–strategist) : প্রকৃত K–স্ট্র্যাটেজিস্টরা স্থিতিশীল পরিবেশে বাস করে। অর্থাৎ এদের পরিবেশ হঠাৎ কোনো অজানা ঘটনায় অস্থির হয় না। সুতরাং এই জাতীয় জীব প্রজাতি তাদের বহন ক্ষমতার (carrying capacity) নিকটে পৌঁছতে পারে। এখানে K দ্বারা বহন ক্ষমতা (carrying capacity) কে বোঝায়।

r ও K স্ট্র্যাটেজিস্টের তুলনা (Comparison between r and K strategists) :

বৈশিষ্ট্য	r অস্থিতিশীল পরিবেশ যা জীব ঘনত্ব নিরপেক্ষ	K স্থিতিশীল পরিবেশ যা জীব ঘনত্ব নির্ভর
1. জীবের আকার	1. ছোটো আকারের জীবসমূহ	1. বড়ো আকারের জীবসমূহ।
2. গোষ্ঠীর আকার	2. সময়ে সময়ে পরিবর্তনশীল	2. নির্দিষ্ট সময়ে স্থিতিশীল থাকে।
3. অপত্য সংখ্যা	3. অসংখ্য	3. অপত্য সংখ্যা সীমিত।
4. প্রতিযোগিতা	4. হালকা	4. কঠোর।
5. নির্বাচনের মাপকাঠি	5. দ্রুতহারে বিকাশ, অল্প বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন, প্রতিটি জীব একবার মাত্র প্রজনন করে।	5. মৃদুহারে বিকাশ, দেরীতে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন, জীবনকালে প্রতিটি জীব একাধিকবার প্রজনন করে।
6. জীবনকাল	6. সংক্ষিপ্ত, সাধারণত 1 বছরের কম	6. দীর্ঘ, সাধারণত 1 বছরের বেশি।
7. সাকসেসনের পর্যায়	7. প্রারম্ভে ঘটে।	7. বিলম্বে ঘটে।
8. উদ্দেশ্য	8. উৎপাদনশীলতা।	8. কর্মদক্ষতা।
9. সারভাইভরশিপের ধরণ	9. অবতল, যেখানে অধিকাংশ জীবের মৃত্যু অল্প বয়সে হয় সামান্য সংখ্যক জীব দীর্ঘজীবি হয়।	9. উত্তল ও কৌণিক, যেখানে অধিকাংশ জীব সম্পূর্ণ জীবনকাল বেঁচে থাকে।

❑ পপুলেশনের অন্তঃবিক্রিয়া, গজের নীতির সমর্থনে পরীক্ষামূলক উদাহরণ, লট্‌কা–ভলটেরা সমীকরণ (Population Interaction, Gause's Principle with laboratory and field examples, Lotka–Volterra equation) :

পপুলেশনের অন্তঃবিক্রিয়া (Population interactions) :

বৃহত্তর অর্থে প্রতিযোগিতা বলতে একই খাদ্যের জন্য দুটি জীব পপুলেশনের মধ্যে সংঘাতকে বোঝায়। প্রজাতির মধ্যে অন্তঃবিক্রিয়ার ফলে প্রজাতির সদস্যদের বৃদ্ধি এবং বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। আন্তঃপ্রজাতি প্রতিযোগিতার দুটি অবস্থা দেখা যায়। যেমন—(i) হস্তক্ষেপমূলক প্রতিযোগিতা (Interference competition) এবং (ii) শোষণমূলক প্রতিযোগিতা (Exploitation competition)।

প্রতিযোগিতার ফলে প্রতিযোগি প্রজাতির জীবদের মধ্যে বাস্তুতান্ত্রিক বিভাজন তৈরি হতে দেখা যায়। প্রতিযোগি জীবের একই প্রকার বৈশিষ্ট্যের প্রজাতি হলেও তাদের মধ্যে বাস্তুতান্ত্রিক বিভাজনের ঘটনা **প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কার নীতি** (competitive exclusion principle)। অপরদিকে প্রতিযোগিতার প্রভাবে প্রতিযোগি প্রজাতি একই পরিবেশে বাস করার জন্য অভিযোজিত হয়। একে **কো–এক্সিসটেন্স** (Co–existence) বলে।

(i) হস্তক্ষেপমূলক প্রতিযোগিতা (Interference competition) : যেখানে দুটি প্রজাতি একই পরিবেশে পরস্পর আক্রমনাত্মক অবস্থার মুখোমুখি হয় কিম্বা একটি প্রজাতি অপর প্রজাতির বাস্তু অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করে তখন তাকে হস্তক্ষেপমূলক প্রতিযোগিতা (Interference competition) বলে।

Scanned by CamScanner

(ii) **শোষণমূলক প্রতিযোগিতা (Exploitation competition) :** যখন একটি প্রজাতির সদস্যরা অন্য প্রজাতির বেঁচে থাকার রসদ যেমন—খাদ্য, বাসস্থান কিম্বা শিকার ওই প্রজাতির সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে না এসে অধিকার করে তখন এই ঘটনাকে শোষণমূলক প্রতিযোগিতা বলে।

বাসস্থান কিম্বা বিচরণ ভূমি, খাদ্য এবং পুষ্টি, আলো, বর্জ্যবস্তু, মাংসাশী প্রাণীর আক্রমণ, রোগ–ব্যাধি প্রভৃতি এবং অনেক বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তঃবিক্রিয়া (mutual interactions) ইত্যাদি প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃবিক্রিয়ার কারণ।

গজ–এর পরীক্ষা এবং তাঁর প্রবর্তিত প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কার (Gause's experiment and his principle of competitive exclusion) :

বাস্তুবিদ G. F. Gause (1934, 1935) খ্রিস্টাব্দে প্রতিযোগিতামূলক আন্তঃবিক্রিয়ার ওপর পরীক্ষানীরিক্ষা করে একটি নীতি প্রণয়ন করেন। যা গজের সূত্র বা নীতি (Gause principle) নামে খ্যাত। গজের সূত্রের বিশেষত্ব ছিল এই যে এই নীতি **প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কারের** (competitive exclusion) ঘটনার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

গজ (Gause) তাঁর পরীক্ষায় আলাদা টেস্টটিউবে *Paramoecium caudatum* এবং *Paramoecium aurelia* নামক খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত দু'টি সিলিয়েট প্রোটোজোয়াদের নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যাকটেরিয়ার খাদ্যের মধ্যে পালন করেন। আলাদা আলাদা টেস্টটিউবে *P. caudatum* এবং *P. aurelia*–এর পপুলেশন যথাযথ বৃদ্ধি পায় ফলে এরা **সিগময়েড** (sigmoid) বৃদ্ধি দেখায়। পক্ষান্তরে যখন দুটি ভিন্ন প্রজাতি *P. caudatum* এবং *P. aurelia* একই টেস্টটিউবে একই খাদ্য মাধ্যমে রাখা হয়েছিল তখন *P. caudatum* বেঁচে থাকতে পারে না কিন্তু *P. aurelia*–এর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় ফলে *P. caudatum* প্রতিযোগিতায় পরাজিত হয়ে মারা যায়। সুতরাং এই ঘটনা প্রতিযোগিতামূলক বহিস্কারের একটি প্রকৃষ্ট ঘটনা।

অপরদিকে একই খাদ্য মাধ্যমে *Paramoecium caudatum* ও *Paramoecium bursaria* কে রেখে Gause দেখতে পান যে এই দুই প্রজাতি টেস্টটিউবের খাদ্য মাধ্যমের ভিন্ন ভিন্ন স্তর থেকে খাদ্যগ্রহণ করে বেঁচে থাকে। এই ঘটনাটি প্রতিযোগিতামূলক বহিস্কার নয়। এটি একই সঙ্গে বসবাসের (co–existence) জন্য একটি প্রক্রিয়া।

দেখা গেছে যে একই জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন প্রজাতির পপুলেশনের নিচ্ এক হয় না। অর্থাৎ **একই জীবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত দুটি ভিন্ন প্রজাতির পপুলেশনের নিচ্ কখনও এক হবে না** একে **Gause's Principles** বলে। যদি প্রকৃতিতে এমন ঘটনা ঘটে যাতে দুটি ভিন্ন প্রজাতির পপুলেশন একই নিচ্এ অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছে তখন প্রকট প্রজাতির প্রতিযোগিতায় দুর্বল পপুলেশন পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং স্থায়ীভাবে অবলুপ্ত হয়। অর্থাৎ একই জীবগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন পপুলেশনকে বেঁচে থাকতে হলে তাদের নিচ্ও পৃথক হতে হবে। বসতিস্থান এক হতে পারে কিন্তু নিচ্ কখনও এক হয় না।

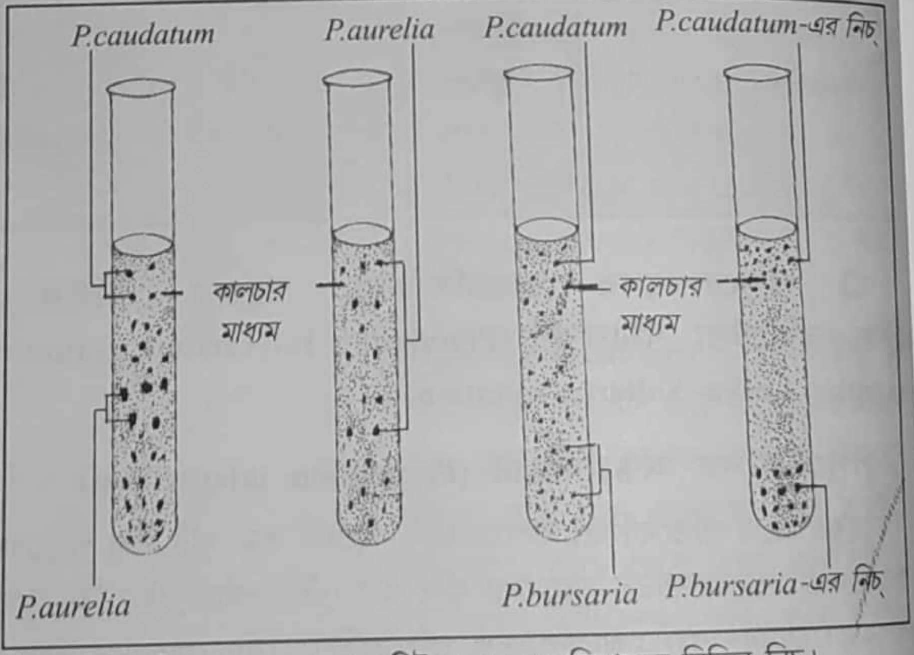

চিত্র ১০ : কালচার টিউবে প্যারামেসিয়ামের বিভিন্ন নিচ্।

পূর্বে আলোচিত পরীক্ষার ফলাফল থেকে বোঝা যায় বিজ্ঞানী Gause–এর পরীক্ষাটি নিচ্ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা প্রকাশ করেছে।

যদিও *P. caudatum* ও *P. aurelia* উভয়ের নিচ্ একই প্রকার কিন্তু *aurelia*-র জনন হার এত বেশি যে তাদের পপুলেশনের বৃদ্ধি *P. caudatum* কে অবলুপ্ত হতে বাধ্য করেছে। আবার অন্য একটি কালচার টিউবে যখন *P. caudatum* এবং *P. bursaria* একই সঙ্গে কালচার করেন তখন তারা উভয়েই সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকে। যদিও তাদের খাদ্য একপ্রকার কিন্তু তারা কালচার টিউবের বিভিন্ন স্থানে বাস করে। *P. caudatum* কালচার টিউবের উপরের দিকে এবং *P. bursaria* কালচার টিউবের নিম্নদিকে বাস করে এবং এই সামান্য পৃথকীকরণ তাদের দুটি পৃথক নিচ্ গঠন করেছে বলেই তারা বেঁচে আছে।

Scanned by CamScanner

প্রথম ঘটনা থেকে প্রমাণিত হল যে দুটি ভিন্ন প্রজাতি একই নিচে বাস করতে পারে না আর দ্বিতীয় ঘটনা থেকে প্রমাণিত হল বেঁচে থাকতে হলে প্রত্যেক প্রজাতির নিচ্ পৃথক হতে হবে। অনেক সময় এক প্রজাতির নিচ্ অন্য প্রজাতির নিচ্‌কে আংশিক ওভারল্যাপ করে এবং যতক্ষণ খাদ্য সরবরাহের পরিমাণ অফুরন্ত থাকে ততক্ষণ উভয়ে জীবিত থাকে কিন্তু খাদ্য ও বাসস্থানের সংকুলান না হলে দুর্বল প্রজাতির অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক নির্বাচনই নিচ্ পৃথকীকরণ ও অবলুপ্তির প্রধান নিয়ন্তা। Gause–এর পরীক্ষার ফলাফল গ্রাফের সাহায্যে প্রকাশ করলে এইরূপ চিত্র পাওয়া যায়।

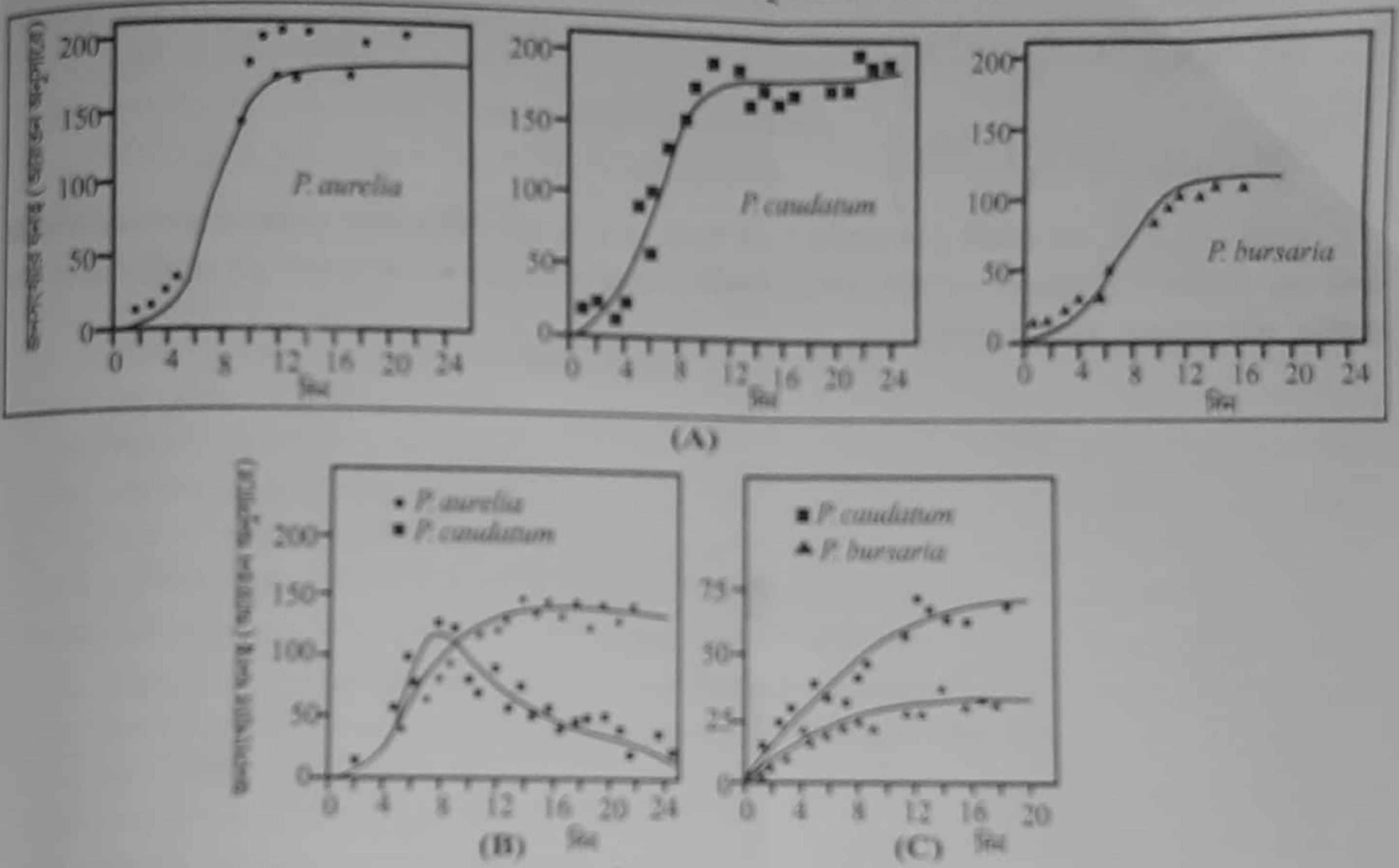

চিত্র ১১ : *Paramoecium*–এর তিনটি প্রজাতির মধ্যে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা।

(A) প্রথম পরীক্ষার ফলাফল Gause লক্ষ করেন পৃথক পৃথক অবস্থায় *Paramoecium*–এর তিনটি প্রজাতিই একইভাবে বেঁচে থাকে।

(B) *Paramoecium caudatum* এবং *P. aurelia* একই খাদ্য মাধ্যমে রাখা হলে *P. caudatum*–এর বৃদ্ধি ভীষণভাবে হ্রাস পায়।

(C) *Paramoecium caudatum* এবং *Paramoecium bursaria* একই খাদ্য মাধ্যমে একসঙ্গে রাখলে উভয়েই বৃদ্ধি পায়।

নিচ্ অধিক্রমণ (Niche overlap) :

Gause এর একটি পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে দেখা যায় *Paramoecium*–এর দুটি প্রজাতি *P. caudatum* এবং *P. bursaria* একই টেস্টটিউবের মধ্যে একই খাদ্য (bacteria) ভাগাভাগি করে খেয়ে বেঁচে থাকছে। টেস্টটিউবের উপরের দিকে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া সংখ্যায় অধিক থাকে এবং এখানে O_2 গাঢ়ত্ব কম। এই পরিবেশে অবস্থিত ব্যাকটেরিয়া খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে *P. bursaria* বেঁচে থাকে। এখানে সম্পূর্ণ টেস্টটিউবটির ব্যাকটেরিয়া কালচার দুটি ভিন্ন প্রজাতির *Paramoecium*–এর মৌলিক নিচ্ (fundamental niche)। কিন্তু বাস্তবিক নিচ্ (realized niche) হল টিউবের আলাদা আলাদা অংশ। এখানে *Paramoecium*–এর দুটি প্রজাতিই একই মৌলিক নিচ্–এ বেঁচে থাকার কারণ এদের নিচ্ অধিক্রমণ (Niche overlap) খুব সামান্য।

Gause–এর পরীক্ষার ফলাফল :

Gause তাঁর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলেন যে একাধিক প্রজাতি একই মৌলিক নিচ্–এ দীর্ঘদিন সহবাস করতে পারে না। খাদ্যের অভাব হলে এবং প্রজাতিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং এতে একটি প্রজাতিই জয় লাভ করে। দুটি প্রজাতিকে একই নিচ্–এ দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে হলে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সরবরাহ এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ হওয়া আবশ্যক। তা না হলে একটি প্রজাতি বেঁচে থাকবে এবং অপরটি বিলুপ্ত হবে। এই ঘটনাকে বলা হয় **প্রতিযোগিতামূলক বহিষ্কার** (competitive exclusion)।

Scanned by CamScanner